তারিখ ... 23 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক হামলা ও নাগরিক নিরাপত্তা

পাকিস্তান | জেবা টি. হাশমী

পাকিস্তানি বিশ্লেষক

ঘটনাটি আবার ঘটল। এক বছর এক মাস পর পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরেকটি ভয়াবহ হামলা হলো। এবার সন্ত্রাসবাদীদের নিশানা পেশোয়ার থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরবর্তী চরসাদ্দার বাচা খান ইউনিভার্সিটি। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে যা বুঝেছি, চারজন সন্ত্রাসবাদী বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রবেশ করে একজন অধ্যাপকসহ ২১ জনকে হত্যা এবং ৬০ জনের বেশি মানুষকে আহত করেছে। উপাচার্যের ভাষ্যমতে, হামলার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে কমবেশি তিন হাজার শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। বাচা খানের ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটি কবিতা পাঠের আয়োজনে অতিথি ছিলেন আরও ৬শ' জন। যদিও এটা স্বস্তিকর যে, সেনাসদস্যদের দ্রুত পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে আরও বড় সংখ্যার মৃত্যু এড়ানো গেছে; কিন্তু এর অর্থ এটা নয়– সন্ত্রাসবাদীরা ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুত তারা ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার যে কোনো ফাঁকফোকর নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে।

আমাদের ভুলে যাওয়া চলবে না যে, বাচা খান বিশ্ববিদ্যালয় ও গত বছর আর্মি পাবলিক স্কুলের পাশাপাশি ২০০৯ সাল থেকে পাকিস্তানে ৯ শতাধিক বিদ্যালয়ে হামলা হয়েছে। আমাদের সন্তানরা এখন একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি। ইতিমধ্যে কিছু পদক্ষেপ সত্ত্বেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা এখনও কর্তৃপক্ষের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে রয়েছে। যেমনটি স্বাভাবিক, হামলার পর থেকে নিন্দার ঝড় বয়ে চলেছে। নিহত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, নিরাপত্তা রক্ষীদের 'শহীদ' হিসেবে দেখা হচ্ছে। হতে পারে সঠিকভাবেই; কারণ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সত্যিই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এটা কি তাদের প্রতি ন্যায্যতা, যারা কোনোভাবেই 'শহীদ' হতে চায়নি? তারা 'সেখানে' গিয়েছিল পড়তে ও ভবিষ্যতে পেশাজীবী হিসেবে জীবনযাপন করতে। তারা কি তাদের জীবন এভাবে বিলিয়ে দিতে গিয়েছিল? তাদের সম্মানে দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার কি কোনো অর্থ আছে? আর্মি স্কুলে হামলায় নিহত এক শিক্ষার্থীর মা চিৎকার করে কেঁদে বলেছিলেন, তিনি তার বুকের ধনকে শহীদ হতে দিতে চাননি; চেয়েছিলেন পড়াশোনা শেখাতে। বস্তুত এভাবে নিহতদের 'শহীদ' আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে প্রকৃত সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃত সংকট হচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় আমাদের রাষ্ট্র আসলে কতটা গুরুত্ব দিয়ে ভূমিকা পালন করছে? সর্বশেষ হামলার মধ্য দিয়ে অপারেশন জারব-ই-আজাব ও ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের ব্যর্থতাই প্রমাণ হয়েছে। সরকার এখনও সেনাবাহিনীর দাবির কাছে মাথা নত করেই চলেছে; এখনও ক্ষমতা নেই যে নিরাপত্তা অবকাঠামো ও অভিযানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। সন্ত্রাসবাদী বা সন্ত্রাসবাদে যুক্ত থাকার অভিযোগে আটকদের বিতর্কিত সামরিক বিচারের পর পাকিস্তানের আইনসভা জোরালোভাবে ওই সহিংস পদ্ধতি ও সেনাবাহিনীকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে গৃহীত পদক্ষেপ, তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অদক্ষতা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সন্ত্রাসবাদ দমনে সেনাবাহিনীর সাফল্য নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। খাইবার পাখতুনখাওয়ার তালেবানপ্রধান উমর মনসুরকে আর্মি স্কুলে হামলার জন্য দায়ী করা হলেও তালেবানের অন্য একটি উপদল সেই দাবি অস্বীকার করেছিল। এ ধরনের বিভ্রান্তি বিপজ্জনক এই কারণে যে, 'দূরবর্তী উগ্রবাদী' গোষ্ঠীর কাঁধে দায় চাপিয়ে কর্তৃপক্ষ ঘরের কাছে জন্ম নেওয়া জঙ্গিবাদের ব্যাপারে দায় এড়ানোর সুস্তি পেতে চায়। এ প্রশ্ন তো তোলাই যায়, উমর মনসুরের মতো একজন যখন শিশুদের নিশানা করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও কেন অপারেশন জারব-ই-আজাবের শিকারে পরিণত হয় না? এটাও উল্লেখযোগ্য, পেশোয়ারে একটি সামরিক তল্লাশি চৌকি আক্রান্ত হওয়ার মাত্র একদিন পরই আর্মি স্কুলে হামলার ঘটনা ঘটেছিল।

এ ধরনের একটি ভয়াবহ ঘটনার পরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রায় অদৃশ্য থাকার কারণ, তার নিজ থেকে বিবৃতি দেওয়ার ক্ষমতাও নেই। তিনি লাল মসজিদের মাওলানা আজিজের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে একইভাবে ক্ষমতাহীন থেকেছেন। যদিও ওই মাওলানা জিহাদি মানসিকতা ও জঙ্গিবাদকে ন্যায্যতা দিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে। এমনকি আইএসসহ জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গেও তার যোগসাজশ রয়েছে। এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো অন্য নাম নিয়ে সক্রিয় রয়েছে এবং তাদের সহজে শনাক্ত করা যাচ্ছে না। উপরন্তু কোয়েটা শুরা, হক্কানি নেটওয়ার্ক ও জামাতুদ্দাওয়ার মতো সেসব গোষ্ঠীকে 'কৌশলগত' কারণে সামান্যই স্পর্শ করা হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে অন্যান্য নিষিদ্ধ সংগঠনের যে যোগাযোগের ফলে জঙ্গিবাদে যেসব উপাদান যুক্ত হচ্ছে, তা আমাদের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো রুখবে কীভাবে? অন্য কথা বলতে গেলে, কৌশলগত সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে যেসব সংগঠনে হাত দেওয়া হচ্ছে না, সেগুলো বুমেরাং হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং সরাসরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেনাবাহিনীর তৈরি বর্তমান নিরাপত্তা নীতি দিয়ে এ বছর নাগাদ পাকিস্তানকে সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাসবাদমুক্ত করা যাবে– সেনাপ্রধানের এই দাবি সন্দেহাতীত হচ্ছে না।

রাষ্ট্রের পক্ষে স্কুলগুলোকে দেয়ালে ঘিরে দেওয়া, শিক্ষকদের বন্দুক চালনার প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করা হচ্ছে; কিন্তু এর কোনোটিই আত্মঘাতী বোমাবাজদের রোখার ক্ষেত্রে কার্যকর মনে হয় না। বস্তুত সন্ত্রাসবাদীরা আরও অনেক বেশি দক্ষ ও সুপ্রশিক্ষিত; নেহাত আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সামনে তারা অজেয়ই থেকে যাবে। শিক্ষার্থীদের রক্ষার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবেলায় যদিও অনেক শিক্ষকেরই বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের প্রমাণ রয়েছে; কিন্তু যখন হামলার ঘটনা ঘটবে তখন শিক্ষকদের ঠিক কমান্ডোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি প্রত্যাশিত হতে পারে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য উপরি-কাঠামোনির্ভর নীতি আসলে প্রকৃত অস্ত্র হতে পারে না। এর চেয়ে বেশি কার্যকর হচ্ছে, হামলা ঘটার আগেই তা প্রতিরোধে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়। আমাদের বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা জঙ্গিবাদ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। বেতনভুক তথ্য পাচারকারীর মাধ্যমে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা সম্পর্কে আগাম তথ্যও পেয়ে থাকে তারা। মুশকিল হচ্ছে, এ ধরনের প্রত্যেক সংস্থাই নিজেদের এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে; অন্যদের সঙ্গে সমন্বয় ও তথ্য বিনিময়ে আগ্রহী নয়। একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের অভাব রয়েই গেছে। সমন্বয়ের অভাব কিছু ব্যক্তির আন্তরিকতার অভাব ও অদক্ষতা ছাড়া কিছু নয়; অথচ এই সমন্বয়ই সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে মোড় ঘোরানো ভূমিকা রাখতে পারত।

ডেইলি টাইমস থেকে ভাষান্তর শেখ রোকন